Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 39-49
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আশালতা সিংহের গল্পে নারী

সাগরিকা ঘোষ

শিক্ষক, গয়েরকাটা উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় (উ.মা.), জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In literature, woman character is very much preferred by the authors. Crisis-pain-sufferings-deprivation— the various shades of a female character are explored by different authors from different angles. But, when the same is done by a female writer, it reaches at another level as the writer herself belongs to the same community. The present article attempts to draw the picture of bengali women in the first half of twentieth century by emphasizing their status in family and society on the basis of some selected stories ('Narir Mulya', 'Kalo Meye', 'Chha'bachhar Pare', 'Jatra', 'Meyemanush', 'Rannaghar', 'Atithi', 'Badabou', 'Motar Kena', 'Nari-Charitra', 'Byaktitwa O Prem') of Ashalata Singha.

Keywords: Ashalata Singha, Status of Women, Family and Society.

নর-নারীর একত্র পথচলার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু মানবসভ্যতার। সূচনার সেই প্রাক্-লগ্নে নারী-পুরুষ ছিল পরস্পরের সম্পূরক। এদের যৌথ অবদানেই এগিয়ে চলে সভ্যতার রথ। কিন্তু পরবর্তীতে পুরুষতন্ত্রের উত্থানে নারীর সামাজিক অবস্থানের অবনমন ঘটে। ছন্দপতন হয় তাদের সম্মিলিত পথচলায়। ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে নারী পুরুষের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, গতিবিধি সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক এই বৈষম্যের ছবি ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যেও সমানভাবে উঠে আসে। সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারী ও নারীর সংকট। প্রত্যেক স্রষ্টা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে ফুটিয়ে তোলেন নিজ সাহিত্যে। তবে নারীর বঞ্চনা-যন্ত্রণা-আর্তি এক ভিন্নমাত্রা লাভ করে নারীর রচনায়। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের স্বল্পালোচিত কথাকার আশালতা সিংহের গল্পে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজ-পরিবারে নারীর অবস্থানের একটি রেখাচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে।

'নারীর মূল্য' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গল্পে আশালতা সিংহ আমাদের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। গল্পের শুরুতে দেখি, গল্পকথক মিস্টার মুখার্জির প্রতিবেশীর বাড়িতে পুত্রসন্তান জন্মানোয় আনন্দসূচক শাঁখ বেজে ওঠে। তিনটি মেয়ের পর নীরজার এই পুত্র সন্তানের জন্ম। তৃতীয়বার সে যখন গোলাপফুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ের জন্ম দেয়; তখন দাইয়ের শত অনুরোধেও সেই মেয়ের দিকে তাকায় না, মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে নীরজা বলে 'মেয়ের মুখ আর যেন আমাকে দেখতে না-হয়, এই আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি'[১]। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোন্ যন্ত্রণা থেকে একজন মা নিজ সন্তানের মুখ দেখতে অস্বীকার করেন। বাঙালি পরিবারে মেয়ে ও ছেলেসন্তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ছেলেসন্তান হলে পরিবারের লোকজন যতটা খুশি হন, মেয়েসন্তানের আবির্ভাবে ততটাই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর এর দায় বর্তায় মেয়ের মায়ের ওপর। পরিবারে মেয়েটি যেমন

কোনো অভ্যর্থনা পায় না, তেমনি অপরাধী হয়ে থাকতে হয় তার মাকে। তিনটি মেয়েসন্তানের জন্ম দেওয়ায় নীরজাকেও শাশুড়ির খোঁটা ও স্বামীর মুখভারের জ্বালা সহ্য করতে হয়। আর সেই কারণেই নীরজার কাছে কন্যাসন্তান এতো অনাকাঙ্ক্ষিত।

মিস্টার মুখার্জির একটিমাত্র সন্তান এবং সে মেয়ে। তবে ছেলে-মেয়ের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেন না। মেয়ে শোভার শিক্ষাদীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শোভার মা কন্যা ও পুত্রসন্তানের বিভেদ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। মেয়েকে বেশি আদর-আহ্লাদ দিতে তিনি যেমন ভয় পান, তেমনি মাস্টারমশাই শোভাকে সবকিছু যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচারের শিক্ষা দিলে তারও বিরোধিতা করেন। তার হতাশা ও ভয়ের কারণ স্পষ্ট তার বক্তব্যে—

> *"মা-বাপে মেয়েকে শুধু আদরই দিতে পারে কিন্তু তার ভাগ্য ত আর গড়ে দিতে পারে না।...এ ত আর ছেলে নয় যে, জোর খাটবে। যা খুশি করতে পারব। তাই সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। বক্‌লে মনে কষ্টও হয়, অথচ আদর দিতেও ভয়ে বুক কাঁপে।"*[২]

বোঝা যায়, মেয়ের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের প্রতিই শোভার মা ইঙ্গিত করেছেন। বাঙালি সমাজে মেয়ের বিয়ের পর তার ওপর আর বাবা-মায়ের কোনো অধিকার খাটে না। ভালো পরিবার ও স্বামী পেলে মেয়েটি সুখে থাকে, না হলে তার দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সেই কারণেই মা-বাবা মেয়েসন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চান, যাতে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলতে তার কোনো অসুবিধে না হয়। কন্যাসন্তানকে তাই ছোটো থেকেই অভিভাবকেরা যুক্তি-তর্কহীন অন্ধভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চান। শোভার মাও এর ব্যতিক্রম নন।

মিস্টার মুখার্জির বাড়িতে বেড়াতে আসা মিসেস গুপ্তা ও মিসেস দাসের মেয়ে যথাক্রমে স্কটিশ চার্চে বি.এ. ও বেথুনে আই.এ. পড়ে। পড়াশোনার পাশাপাশি তারা গান গাওয়া, এস্রাজ বাজানো, টেনিস খেলা, সবেতেই পারদর্শী। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অভিবাবকদের এই যত্নশীলতা মনে আশা জাগায় বৈকি! তবে মিসেস গুপ্তা ও মিসেস দাসের কথোপকথনে উঠে আসে প্রকৃত সত্য। পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন বলেই যে তারা মেয়েদের পড়াচ্ছেন, তা নয়। তাদেরও প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য কন্যাসন্তানকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুপাত্রের অভাবে তারা অনেকটা দায়ে পড়েই মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করেছেন।

প্রতিবেশী বোসেদের মেয়ে নিরুকে পাত্রপক্ষ অপছন্দ করে সে গান না জানায়। নিরুও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। এবার যাতে আর পূর্বের ঘটনার পুনারবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য সে উঠেপড়ে লাগে। গলায় সুর খুব একটা না থাকলেও দিনে দুই-তিন ঘণ্টা রেওয়াজ করে মোটে তিন-চার মাসেই সে মোটামুটিভাবে একটা গাওয়ার জায়গায় চলে আসে। নিরু ও তার গান শেখার অদম্য চেষ্টা সম্বন্ধে কথকের বেদনাগভীর উপলব্ধি—

> *"এ শুধু তার কাছে গান নয়, জীবন-মরণের সমস্যা। কোন খেয়ালী বরপক্ষ আবার যদি তাহাকে দেখিতে আসিয়া গান-জানার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, তখন তাহাকে পিছাইয়া দাঁড়াইলে আর চলিবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের ইহার বাড়া সমস্যা আর নাই। তাহার মূল্য যে কতখানি সে কথার চরম বিচার এই কষ্টিপাথরেই যাচাই হইবে। যাচাই হইবার আর কোন উপায়, আর কোন পথ নাই।"*[৩]

প্রকৃতই, আমাদের দেশে তথা বাঙালি সমাজে মেয়েদের যেন এই একটিই গতি— বিয়ে। বিয়েতেই নারী জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা, মূল্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। সেটিকে পাখির চোখ করেই তাদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলি পরিচালিত তথা নিয়ন্ত্রিত হয়। অথচ এটি যে মেয়েদের জীবনে সবসময়ই খুব সুখকর পরিণতি নিয়ে আসে, এমন নয়। বরং চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই নির্দিষ্ট করে। তাসত্ত্বেও সমাজ-পরিবারের এই একমুখী চিন্তাধারা তাদের চেতনার জড়ত্বকেই প্রমাণ করে।

"ইস্কুল ইস্কুল করেই গেলে মা। ইস্কুলে পড়ে কি জজ মেজিষ্টর হবে না টাকা রোজগার করতে হবে তোমাকে?"[৪]

'কালো মেয়ে' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) গল্পে স্কুলের প্রতি অরুণার আগ্রহ প্রসঙ্গে তার কাকিমা এই মন্তব্য করেন। বাস্তবিকই, মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে এটাই সেকালের সমাজ-মানসিকতা। মেয়েদের স্বনির্ভরশীলতার গুরুত্ব সেদিনের সমাজে মান্যতা পায়নি। অরুণাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। তাদের আসার বেশকিছু দিন আগে থেকেই তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার জন্য পুষ্টিকর খাওয়ার, পর্যাপ্ত ঘুম, মুখে মাখার প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো দোষ হিসেবে যা বিবেচ্য হয়, তা হল গায়ের কালো রং। অরুণা সেই দোষেই দুষ্ট। আর সেই কারণে পাত্রপক্ষের কাছে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতেই এত ব্যবস্থা। কিন্তু তারপরও স্কুলের মেধাবী ছাত্রী অরুণা বিয়ের পরীক্ষায় ফেল করে যায়। তার সুমুখশ্রী, মিষ্টি গানের গলা, ইংরেজির জ্ঞান কিছুই পাত্রপক্ষের কাছে গুরুত্ব পায় না। সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে তার গাত্রবর্ণ। যদি আর কোনোদিনই তাদের কালো মেয়ের বিয়ে না হয়, সেই আশঙ্কায় অরুণার বাবা-মা আবার মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন, যাতে তাদের অবর্তমানে সে করে খেতে পারে। কিন্তু বিয়ের স্বপ্ন-কল্পনায় সাময়িকভাবে হলেও পড়াশোনার প্রতি কিশোরী অরুণার মনঃসংযোগ নষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেকালে বিয়েকেই মেয়েদের জীবনেরই প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা হতো এবং সেক্ষেত্রে মেয়েদের গুণ নয়, রূপই ছিল প্রধান বিবেচ্য। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে মানুষ হিসেবে মেয়েদের সম্মানের স্থানটি যে কতটা গৌণ ছিল, এখান থেকেই তা স্পষ্ট হয়। আবার বিয়েকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মেয়েদের পড়াশোনাও অপ্রতিহত ধারায় অগ্রসর হতে পারতো না। সেকালে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পথটি যে মোটেই মসৃণ ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সদ্যবিবাহিতা ছোটো বোন সুধীরার সঙ্গে দেখা করতে সুনীতি বাপেরবাড়ি যায়। সংসারের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ায় প্রায় ছয়-সাত বছর পর তার এই বাপের বাড়ি যাত্রা। সেখানে যাওয়া প্রসঙ্গে শৈশবের নানা স্মৃতি একসঙ্গে সুনীতির মনে ভিড় করে আসে। অনেক দিন বাদে দুই বোনের দেখা হওয়ায় তাদের আনন্দের শেষ থাকে না। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে যায়। দুই বোনেরই উপলব্ধি—

"স্মৃতির সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিয়া তাহারা ঠিক যে বস্তুটি পাইবার আশায় উতলা হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেই বস্তুটি আর নাই। অতীত জীবনটা কল্পনার মধ্যে আছে, কিন্তু ঠিক তাহারই মাঝে ফিরিয়া যাইবার আর পথ নাই।"[৫]

সুনীতি ও সুধীরার অজ্ঞাতসারে তাদের অতীতজীবনে ফেরার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাদের বর্তমান বিবাহিতজীবন ও চিন্তা-চেতনা। বাপেরবাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোনের সাথে দেখাসাক্ষাৎ, গল্পগুজব, হাসিঠাট্টার পাশাপাশি দুই বোনের একান্ত আলাপচারিতায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে স্বামী-সন্তানের কথা, শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ। মাঝরাতে ঝড়ের দাপটে ঘুম ভেঙে উঠে বসে সুনীতি তার চিরপরিচিত অভ্যস্ত গৃহস্থালী সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে হলেও বাপের বাড়িতে আসার কথা সে ভুলে যায়। মন জুড়ে থাকে নিজ সংসারের চিন্তা। এক অদ্ভুত টানাপোড়েনে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন—

"বাপের বাড়ী আসিতে সাধও যায়, কিন্তু বেশিদিন থাকিতে গেলেই মনে টান ধরে। সে মনের হাজার তন্তুতে গৃহের আকর্ষণ জড়াইয়া গেছে। মাঝ রাত্রিতে ঝড়ের দৃশ্যে আগেকার মত সমস্ত মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ছুটিয়া যাইতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় সেই একটি পরিচিত গৃহে এতক্ষণ কি হইতেছে, চাকররা যথাসময়ে ঘরদুয়ার বন্ধ করিয়াছে কিনা, পরের দিন সকালে উঠিয়া ধূলা ঝাড়িবে কিনা। হয়তো না দেখা শোনায় কাজের কতই ত্রুটি হইতেছে। এ সব চিন্তা সর্ব্বদাই আনাগোনা করিতেছে।

আগেকার দিনের রহস্যময়ী সেই কিশোরীর পরিবর্ত্তে চিন্তাক্লিষ্টা সংসারভারাক্রান্তা এক প্রবীণা জাগিয়া উঠিয়াছে। সংসারে এই কি চিরন্তন সত্য?"[৬]

অস্বীকার করার উপায় নেই, বিবাহিতা বাঙালি নারীর জীবনের এটিই চিরন্তন সত্য। যেই মুহূর্তে নারী স্বামীগৃহে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত থেকেই বাপের বাড়িকে পেছনে ফেলে নতুন সংসারকেই সে আপন করে নেয়। তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় তার সত্তার সঙ্গে। তাই দুই দিনের জন্য বাপের বাড়িতে এলেও তার মন পড়ে থাকে নিজ গৃহস্থালীতেই।

গল্পে দেখি সুনীতি শিক্ষিতা আধুনিক নারী। তবে শিক্ষা তার মনের সংস্কার দূর করতে পারেনি। তাই প্রতিদিন সকালে শিবপূজা করে স্কুলে যেতে তার ছোটোমেয়ে মালিকার অসুবিধে হলেও পুণ্যমাস বৈশাখে সে মেয়েকে শিবপূজা থেকে অব্যাহতি দেয় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস 'মেয়ে শিবপূজা করিবে, আর সেই তপস্যার বলে সর্ববাঞ্ছিত স্বামী মিলিবে'[৭]। আসলে স্বামী ও সংসার লাভকেই নারীজীবনের মোক্ষ বলে মনে করা হয়। সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে নারীর শিক্ষালাভ। স্বনির্ভরতা, স্বাবলম্বিতার চিন্তা তো অনেক দূরের কথা। যেমন করেই হোক আগে বিয়ের পথ প্রশস্ত করা দরকার। আনুষঙ্গিকভাবে শিক্ষালাভ হলেও ভালো, না হলেও ভালো। শিক্ষা বড়োজোর নারীর ভালো বৈবাহিক সম্বন্ধ লাভের সহায়ক হতে পারে। এর অতিরিক্ত নারীজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সেকালের সমাজ স্বীকার করে না। সুনীতির মনোভাবেও এই সমাজ-মানসিকতারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ভাই নির্মলের সঙ্গে সুনীতির কথোপকথনে উঠে আসে নারী সম্বন্ধে সেকালের তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষ সমাজের মনোভাব। নির্মল তার দিদিকে বলে—

"তোমাদের কাছ থেকে পুরুষ জাতি যা দাবী করে সেটা এক সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়াও নয়, এক সঙ্গে তর্ক বা এক সঙ্গে চাকরী করাও নয়। একটা সর্বব্যাপী প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতাই তাদের সব চেয়ে বড় চাওয়া তোমাদের কাছে।"[৮]

তার আরও বক্তব্য—

"আধুনিককালে স্ত্রী-পুরুষে অবাধ মেলামেশার ফলে মেয়েরা অনেক জায়গায় সেই নির্লিপ্ত দূরত্ব সেই সহজ সম্ভ্রমবোধ রাখতে পারছে না; সে বোধ সমস্ত সংযম আর শালীনতার মূল কথা।"[৯]

'ছ'বছর পরে' (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে নির্মলের কথাবার্তা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তা হল— শিক্ষা তার জ্ঞানের প্রসার ঘটালেও চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারেনি, অন্তত নির্মলের মতো শিক্ষিত পুরুষদের, যারা নিজেদের চিন্তাচেতনার সীমাবদ্ধতা না বুঝেই নারী সম্বন্ধে মতামত দানে অকণ্ঠচিত্ত। নারীও যে পুরুষের মতোই পূর্ণাঙ্গ মানুষ; আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, শরীর-মন মিলিয়ে তাদেরও যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে; কেবল একটি বিশেষ শ্রেণির (পুরুষ শ্রেণি) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানেই যে তাদের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে না— নির্মলের সমমনোভাবাপন্ন পুরুষেরা তা বোঝে না। প্রশ্ন জাগে, নারী নিজেও কি তা বুঝতে পারে? বোধ হয় না। আর তাই নির্মলের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে সুনীতির মতো শিক্ষিত নারীও।

'স্বামীর শুধু সেবা করাই নয় তাঁর প্রতি কাজ ও চিন্তার গুরুভার বহন করে তাঁর প্রকৃত সহচরী হওয়ার'[১০] মানসিকতা নিয়ে অসীমা শ্বশুরবাড়ি আসে। সুন্দরী শিক্ষিতা অসীমা কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সাবলীল সপ্রতিভ। কিন্তু রূপ বাদে আর কোনোটিই তার শ্বশুরবাড়িতে গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। অসীমার ছোটো করে ঘোমটা দেওয়া, মাথার বামদিকে বাঁকা সিঁথি করা, হাতে ঘড়ি পরা, বোবার মতো মুখ বুজে বসে না থেকে সকলের সঙ্গে কথা বলা, প্রশ্নের জবাব দেওয়া, স্বামীর বন্ধুদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা, দিনের বেলায় সকলের সামনে স্বামীকে দেখেও মাথায় কাপড় না দেওয়া— এই সমস্তই প্রবল নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-পরিজন, বিশেষত শাশুড়ির কাছে। অসীমার শিক্ষিত উদারমনস্ক স্বামী শশাঙ্কের কেবল একটিই দুর্বলতা—

মায়ের কথার ওপর কথা বলার শক্তি তার নেই। আশাহত হয় অসীমা। খুব দ্রুত সে উপলব্ধি করে, 'ঘরের বন্ধ দরজা-জানালাই ভালো। বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে বেশী খোলা আলো-বাতাস ভালো নয়।'[১১] ফলে স্বামীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সে আর অংশ নিতে চায় না, সারা দিতে পারে না তার রোম্যান্টিক আহ্বানে। জ্যোৎস্নারাতে তিনতলার ছাদের খোলা আকাশের স্বর্গীয় বাতাবরণ ছেড়ে অসীমা নিজেকে সীমায়িত করে ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে। 'যাত্রা' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) গল্পে লেখিকা বাঙালি নারীর এই চিরাচরিত পথে যাত্রাকেই সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। নারীর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে শ্বশুরবাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে। সবকিছুকে খোলসে পুরে, নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করে পুতুল নাচের পুতুল হওয়াই তাদের নিয়তি।

'মেয়েমানুষ' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) গল্পে লেখিকা বাঙালি সমাজ-পরিবারে মেয়েমানুষের যথার্থ অবস্থান তুলে ধরেছেন। প্রথম শ্রেণিতে আই.এ. পাশ করা ললিতার বিয়ে হয় এক প্রকাণ্ড জমিদার পরিবারে। মেয়েবিদায়ের সময় মা ললিতাকে বলেন, "খুব সাবধানে, খুব বাধ্য নম্র হয়ে চলবে ওখানে। এতদিন পড়া মুখস্ত ক'রে ফার্স্ট হয়ে এসেছ, সে কাজ সোজা। কিন্তু এবার যেখানে যা করতে যাচ্ছ সে অত সহজ নয়। মুখস্ত বিদ্যায় কুলয় না; ভগবানের উপর নির্ভর করে থেকো।"[১২] সংসার-অভিজ্ঞ এক নারীর মুখ থেকে এই কথাগুলি আমরা শুনতে পাই, যা আমাদের জানিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ি জায়গাটি মেয়েদের পক্ষে মোটেই সহজ ঠাঁই নয়, বিশেষত সেকালের প্রেক্ষিতে। সেখানে ভগবানই একমাত্র ভরসা।

ললিতার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশী মহিলাদের গল্পের আসরে কান পাতলে জানা যায়, সেদিনের সমাজ শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের আচার-ব্যবহার প্রত্যাশা করতো। বাড়ির বউ হবে নম্র-ধীর-স্থির-লজ্জাশীলা, বড়োদের কথা মান্য করে চলবে, সাদাসিধেভাবে কাপড় পরে বড়ো করে ঘোমটা দেবে, পায়ে আলতা পরবে, জুতো নয়। আত্মবিশ্বাসী বুদ্ধিমতী ললিতা এই সমস্ত আদব-কায়দাই খুব সহজে আয়ত্ত করে নেয়। মন থেকে এইসব মানার যৌক্তিকতা খুঁজে না পেলেও এইরকম বাহ্যিক বিষয় নিয়ে তর্ক করে সংসারে অশান্তি ডেকে আনার মতো নির্বোধ সে নয়। কিন্তু ললিতা আহত হয় সেই সংসারে মেয়েদের প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করে। তার মতো শিক্ষিত মেয়েকে যে সেই বাড়িতে বউ করে আনা হয়েছে, তা তার শিক্ষাদীক্ষকে গুরুত্ব দিয়ে নয়, পাশের জমিদারবাড়ির ম্যাট্রিকপাশ বউয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। সেবাড়ির পুরুষরা কোনোবিষয়ে মেয়েদের কথা বলা পছন্দ করে না, নারীকে ভাবতে পারে না মেয়েমানুষের অতিরিক্ত কিছু। এই মেয়েমানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা বা মতামতের প্রতি তাদের নেই কোনো শ্রদ্ধা বা আস্থা। আর এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় ললিতার স্বামীও। স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্নভঙ্গ হয় ললিতার। সেবাড়ির মহিলারা তাস খেলে, গল্প করে, ঘুমিয়ে অবসর যাপন করে। বাইরের জগতের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাই ললিতা খবরের কাগজ চাইলে বাড়ির ছোটোছেলেটিও অবাক হয়। এমন দমবন্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে ললিতার শিক্ষিত মন। লেখিকা এখানেই গল্পের ইতি টেনেছেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, যত দমবন্ধকর পরিবেশই হোক না কেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এখানেই কাটাতে হবে, হয়তো জীবন্মৃত অবস্থাতেই। এখান থেকে তার মুক্তির কোনো পথ নেই। কেননা 'ডিভোর্স' শব্দটি আজকের দিনে বহুলপ্রচলিত হলেও সেকালের সমাজে এর অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে।

নারী সম্পর্কে পুরুষের অনুরূপ মনোভাবের প্রতিফলন দেখি 'রান্নাঘর' (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) গল্পেও। স্ত্রী সুধীরারা রান্নার ত্রুটি সম্পর্কে রমেশের মন্তব্য—

> *"মেয়েমানুষের পুরুষ সাজতে গেলে এমনই হয়। নিজের যা কর্তব্য। ঘর-সংসার দেখা, রাঁধাবাড়া এই সবই ভালো করে কর, তা নয় উনি গেলেন জার্মানির যুদ্ধনীতি নিয়ে গবেষণা করতে। খবরের কাগজখানা এলে যেন হুমড়ি খেয়ে তার উপর পড়বে। আর লাইব্রেরী থেকে রোজ রোজ অত বই আনিয়েই বা পড়া কেন?*

মেয়ে মানুষে দিবারাত্রি বই কাগজ নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকলে ঘর-দুয়োরের এমনই ছিরি ছাঁদ হয় বটে। তাইতেই কোন জিনিসেই আর জৌলুষ দেখতে পাইনে, রান্নার ছিরিও তাই এমনই দাঁড়িয়েচে।"[১৩]

সুধীরার সংসারে আগে রাঁধুনি ছিল। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে রমেশ অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। সেখানে পান থেকে চুন খসলে তার রাগ-বিরক্তির সীমা থাকে না। ফলে রাঁধুনি পালায়। রান্নার দায়িত্ব পুরোপুরি এসে পড়ে সুধীরার ওপর। স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে সুধীরা সাধ্যের অতিরিক্তই করে। সারাদিন উনুনের পাড়ে তেতে-পুড়ে সে অত্যন্ত যত্নসহকারে রমেশের জন্য বহু পদ রান্না করে। রমেশ যখন ইচ্ছে তার বন্ধু-সহকর্মীদের বাড়িতে খাওরার নেমন্তণ করে। ফলে এক-একদিন সুধীরা রান্নাঘর থেকে বেরোনোরই ফুরসত পায় না— "রাঁধার পর খাওয়া এবং খাওয়ার পর রাঁধা এই চিরআবর্তমান যন্ত্রে পড়িয়া তাহার দিবারাত্রির সমস্ত সময়গুলি কোথা দিয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, একটি আনন্দের মুহূর্তও আর তাহার বাকি নাই।"[১৪] কিন্তু সন্তুষ্টি নেই রমেশের। সুধীরা জ্যোৎস্না দেখতে, বই পড়তে ভালোবাসে। বাইরের পৃথিবীর খবর বয়ে আনা কাগজে চোখ রাখতে উৎসুক হয়ে ওঠে। আর এসবেতেই আপত্তি তার স্বামীর। স্ত্রী তথা মেয়েমানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা দিতে পারে না তথাকথিত শিক্ষিত-ভদ্র সমাজে বিচরণকারী রমেশ। মেয়েমানুষ ও পুরুষমানুষের বিভেদ সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। গৃহস্থালীর কাজের বাইরে স্ত্রীর ছোটোখাটো ভালোলাগার জায়গাগুলো তার কাছে কোনো গুরুত্ব পায় না। এমনকী মেয়েমানুষও যে মানুষ, তাদেরও যে সংবেদনশীল মন আছে, সেখানেও যে আঘাত লাগলে যন্ত্রণা হয়, এই বোধের কোনো পরিচয় রমেশের কথাবার্তায় পাওয়া যায় না। পদে পদে স্ত্রীকে ব্যঙ্গ-তিরস্কারে তার কোনো কুণ্ঠা নেই। মেয়েমানুষের জীবনকে সে রান্নাঘরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করতেই তৎপর। তাই স্ত্রীকে রাঁধুনির অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারে না রমেশ।

অনাথ হলেও বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিমা একটি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ পায় মামা উপেন্দ্রনাথের স্নেহাশ্রয়ে। সকাল বেলায় উঠে এস্রাজ বাজানো, গান গাওয়া, পড়াশোনা করে কলেজে যাওয়া, নানা বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা-গল্প-তর্ক-বিতর্ক— সব মিলিয়ে তার 'মনটা বিশ্বস্রোতের উপর ভাসমান থাকিত একটি বিকশিত কমলের মত। একখানি রূপে রসে গন্ধে ভরা সদাজাগ্রত মন বিশ্ব-চেতনার মাঝখানে দলে দলে আপনাকে মেলিয়া ধরিতেছে।'[১৫] তার গানের সুরে এই স্নিগ্ধ সতেজ আনন্দময় আত্মার সৌরভই যেন বিতরিত হয়। প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ হয় তার মামার বন্ধুর ছেলে সন্তোষ। সন্তোষের প্রশংসা তাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মানুষের জীবনের মতো অনিশ্চিত বুঝি কিছু নেই। উপেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় তার বিশাল পরিমাণ ঋণের বোঝা। ফলে অন্যান্য আশ্রিতের মতো সন্তোষও অন্যত্র চলে যায়। প্রতিমার দিদিমা একশ টাকা মাইনের এক স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অনাথ নাতনির স্থায়ী আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। প্রতিমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কারণ রাখালবাবুর বক্তব্যে স্পষ্ট—

"মেয়েমানুষে খাটবে, সেটা আর এমন নূতন কথা কি? যখন স্রেফ একটি পয়সা দাবি না করে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সে তো এই যে বড়সড় মেয়ে এসে ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম করবে। নইলে মনেও ক'রো না যে তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, বা তোমার কেতাবি বিদ্যার বহর দেখে ভুলেছিলাম, সে-পাত্র আমি নই।"[১৬]

এমন স্বামীর সান্নিধ্যে টানাটানির সংসারে দুই সন্তানের জননী প্রতিমার স্বাভাবিক রূপান্তরই ঘটে। স্নিগ্ধতার পরিবর্তে রুক্ষ কর্কশতাই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। অভ্যস্ত দিনযাপনের মাঝে পূর্বপরিচিত সন্তোষদা একদিন প্রতিমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে প্রতিমা ডুবে যায় অতীত স্মৃতিতে। দশ বছর আগে মুগ্ধ অভিভূত সন্তোষদা তাকে যে রূপে আবিষ্কার করেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিমা তার সেই পূর্বসত্তায় প্রত্যাবর্তন করে। অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় নিজের আগের ইমেজ। ঝি, মেছুনি, কান্নারত ছোটোছেলের প্রতি বদলে যায় তার ব্যবহার। তার সংসারটি আজ যেন এক স্বর্গীয় শান্তি ও সৌন্দর্যে ঝলমল করে ওঠে। এখন প্রতিমা আর গান না গাইলেও সেই গানের সুরটিকেই যে সে তার জীবন ও গৃহস্থালীর প্রতি গৃহকোণে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে, তা সন্তোষের দৃষ্টি এড়ায় না।

নারীব্যক্তিত্বের বিকাশ তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তথা মানুষজনের ওপর কতটা নির্ভরশীল, 'অতিথি' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গল্পের প্রতিমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা তা দেখিয়েছেন। ভিন্ন মানসিকতার দু'জন পৃথক পুরুষের সান্নিধ্যে একই নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। উদার পরিবেশ ও সহৃদয় সঙ্গী যেমন নারীমন-নারীসত্তার বিকাশ ঘটায়, তাকে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ করে তোলে; তেমনি সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিক ও হৃদয়হীন স্বামীসঙ্গ তার মন ও সত্তার ক্ষয়সাধন করে তাকে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। রাখালবাবুর মতো রুচি-সংস্কৃতিহীন স্বামীর সান্নিধ্যে প্রতিমা তাই রুক্ষ, কর্কশ, মুখরা। আর হৃদয়বান সন্তোষদার সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ, কোমল, অপরূপা।

অংশুমানের সঙ্গে অমিতার বিয়ে হয় মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে। বিয়ের পর অংশুমান অক্সফোর্ডে পড়তে দুই বছরের জন্য বিদেশ যায়। তাদের গ্রামেরবাড়িতে থাকতে অমিতার অসুবিধে হবে বিবেচনা করে তাকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দেয় এবং বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা করে। ফিরে এসে স্ত্রীর লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে তাকে এম.এ.-ও পড়ায়। অংশুমান একটি কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা করে। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলেও স্ত্রীর প্রতি সে কর্তব্যের ত্রুটি করে না। অমিতার যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, তার জন্য ঠাকুর, চাকর, মালী, বেয়ারা— সবেরই সুবন্দোবস্ত করে। এদের নির্দেশ দেওয়া, খাওয়ার টেবিলে অংশুমানকে একটু চা ঢেলে দেওয়া, টোস্টে মাখন লাগিয়ে দেওয়া বা কেকের টুকরো কেটে দেওয়া— এর বাইরে সংসারে অমিতার আর কোনো কাজ নেই। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখেই তাকে সময় কাটাতে হয়। অংশুমানের ভাবনা বা কাজের জগতের সঙ্গে অমিতার কোনো যোগ নেই। একদিন হঠাৎই অংশুমান এক অকল্পনীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়। তার নামে চিঠি লিখে অমিতা বন্ধু বিজনের সঙ্গে বাড়ি ছাড়ে। খবর পেয়ে অমিতার দাদা রজতকান্তি তাকে জোর করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনে। ভুল ভাঙে অংশুমানের। সে উপলব্ধি করে—

"তার নিজের জীবনের দৈন্য, সংগ্রাম, কুশ্রীতা, অপূর্ণতা— এর মাঝে কোনদিন তো সে অমিতাকে ডাকেনি। সে কেবল সাহেববাড়ির ফার্ণিচার কিনে, সৌখীন শাড়ির রং পছন্দ ক'রে আর আধুনিক ডিজাইনের গয়না গড়িয়ে ঐশ্বর্য্যের দেবীকে তার সম্পদের বহরটাই দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েরা যে আসলে মা। তারা আর্ত্তকে সেবা ক'রতে চায়, কুশ্রীকে সুন্দর ক'রে তোলে, অযোগ্যকে যোগ্য ক'রে নেয়— মানুষের জীবনে যেখানে অযোগ্যতা যেখানে অপূর্ণতা যেখানে অভাব সেখানেই তাদের আহ্বান ক'রে না আনলে তাদের হৃদয় ভরে উঠবে কী দিয়ে?"[১৭]

অংশুমান এবার তার জীবনের ভালো-মন্দ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, সমৃদ্ধি-রিক্ততার মাঝে আহ্বান জানায় বাড়ির বড়বউকে। সাড়া দেয় অমিতা। স্বামীর সঙ্গে সে ফিরে চলে তার নিজের সংসারে। 'ড্রইং-রুমের পুতুল'[১৮] হওয়া নয়, স্বামীর জীবন-সংগ্রামের যথার্থ অংশীদার হওয়ার স্বপ্ন তার দু'চোখ জুড়ে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এর অভাবেই একদিন অমিতা বন্ধু বিজনের মধ্যে জীবনসঙ্গীকে খোঁজার চেষ্টা করে। 'বড়বৌ' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন সংসার নারীর প্রাণ। সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নামে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা তাদের কাঙ্ক্ষিত নয়। সহজাত গুণাবলীর দ্বারা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংসারজীবনের যাবতীয় অপূর্ণতা, কুশ্রিতাকে শ্রীময়ী করে তোলাতেই নারীজীবনের প্রকৃত আনন্দ, তৃপ্তি ও সার্থকতা।

কলেজের অধ্যাপক মিহির শৌখিন জীবনযাপনে বিশ্বাসী। সে মনে করে, 'জীবনযাত্রার ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা যতটা উঁচুতা রাখতে পারা যায় ততই মানুষের হৃদয়-মন প্রসার লাভ করে'[১৯]। তার বড়িটি সুন্দর সাজানো-গোছানো। এখনো বিয়ে না করলেও বাড়িতে তার দুটি চাকর, একটি রাঁধুনি, একটি মালী আছে। জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজায় রাখতে কলেজে পড়িয়ে এবং টিউশন করেও সে খরচে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বাড়ির সামনে একটি ছোটোখাটো টেনিসলন তৈরি না করে এবং গাড়ি না কিনে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারে না সে। হবু স্ত্রীর সুখ-সুবিধার্থে এদুটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মিহিরের অভিমত। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা করার আগেই সহকর্মী অসিতের উদ্যোগ-তৎপরতায় মিহির বিয়েটা সেরে ফেলে। পণ না নিয়ে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে সে বাণীকে ঘরে আনে এবং

তার ছোটোখাটো সুবিধে-অসুবিধের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে। বাণী আই.এ. সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ঘরের কাজে সে সুদক্ষ এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট বিচক্ষণও। ঘর-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বাণী মিহিরের অজ্ঞাতে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়। চাকর-বাকরের সংখ্যা কমিয়ে অনেক কাজই সে নিজে করতে শুরু করে। যদিও মিহিরের তাতে অমত। সে স্ত্রীকে এতটুকু কষ্ট করতে দিতে চায় না। একদিন ব্যাঙ্কের বইয়ে চোখ পড়ায় মিহির চমকে ওঠে। পাঁচ বছরের চাকরিতে যেখানে সে মোটে শ'পাঁচেক টাকা সঞ্চয় করে, সেখানে বাণী আসার তিন মাসের মধ্যে সে সঞ্চয় দাঁড়ায় হাজার টাকায়। মিহিরের ভাবাবেগে কোনো আঘাত না করে বাণী নিজ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতায় তাদের সংসারতরণীটিকে সুনির্দিষ্ট খাতে বইয়ে নিয়ে চলে। সবদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনে। সংসার পরিচালনার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করে মিহিরকে—

> *"ওসব ভার তোমার হয়ে আমিই বইব এবং ওসব ভাবনা তোমার হয়ে আমিই ভাববো। তুমি নিরুদ্বেগে থাক।"*[২০]

'মোটর কেনা' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে লেখিকা বাণী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মিহিরের মতো পুরুষ চরিত্র অঙ্কন করে সমাজ-পরিবারে নারীর যথার্থ মর্যাদার স্থানটি সুনির্দিষ্ট করেছেন।

'নারী-চরিত্র'(১৩৪১ বঙ্গাব্দ) গল্পে দেখি ইন্দিরা ও মাধবী ছোটোবেলা থেকেই পরস্পরের খুব কাছের বন্ধু। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হলেও মাধবী নিজ চেষ্টাতেই অনেকদূর লেখাপড়া করে। গান-বাজনাতেও সে পারদর্শী। ধনী পরিবারের মেয়ে ইন্দিরার বিয়ে হয় কলকাতার এক বিত্তশালী পরিবারেই। ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ির সকলেই শিক্ষিত ও উদার মনোভাবাপন্ন। দরিদ্র বান্ধবীর একটি ভালো বিয়ে দেওয়ার ভাবনা থেকে ইন্দিরা নিজ দেওর শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর বিয়ের সম্বন্ধ করে। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে মাধবী নিজের সুখ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইন্দিরাকে সে লিখে জানায়—

> *"বিবাহের কথা সে ভাবেও না; নিজের প্রতি সে নির্মম। তাহার জীবনের একমাত্র সংকল্প কি করিয়া মাতৃহীন তাহাদের দরিদ্র পরিবারটিকে সে বাঁচাইয়া রাখিবে, বৃদ্ধ অসুস্থ পিতার সেবা করিবে, ছোট বোনগুলিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া সৎপাত্রে তাহাদের বিবাহ দিবে।"*[২১]

এক বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রবধূকে এস্রাজ ও গান শেখানোর দায়িত্ব পড়ে মাধবীর ওপর। সেই সূত্রেই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তার পরিচয়। এই বিপত্নীক মাঝবয়সী ম্যাজিস্ট্রেটকে সে ভালোবেসে ফেলে। এতদিনে মাধবী তার সব বোনেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাই নিজের বিয়েতেও তার আর কোনো আপত্তি নেই। প্রেমাস্পদের দায়িত্ববোধের প্রতি মাধবীর পূর্ণ আস্থা। যদিও বিয়ের ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর সে কোনো দাবি রাখে না। ভালোবেসেই সে সুখী। মাধবীর উপলব্ধি—

> *"আমার মত একজন সামান্য মেয়ে, প্রতিদিনের শত সহস্র তুচ্ছতায় যার দিন কেটে যাচ্ছিল, সেও যে এমন ক'রে ভালোবাসতে পারবে, তা কি আমি কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলুম! ভাই, আমি তোমাকে ঠিক কথা দিয়ে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমার জীবনে এ যে কতো বড় বিস্ময়, কতো বড় আনন্দ, তার সীমা আমি নিজেই খুঁজে পাই না।"*[২২]

এই প্রত্যাশাহীন ভালোবাসার জন্য মাধবী সমাজের নিন্দা, অন্তরঙ্গ বান্ধবীর বিরাগ— সমস্তকিছুকে মাথা পেতে নেয়। গল্পের শেষে আমরা দেখি, মাধবী তার ভালোবাসার প্রতিদান পায় না। তার প্রগাঢ় ভালোবাসাকে অবলীলায় উপেক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেট অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। আর এখানেই নারী-পুরুষদের পার্থক্য লেখিকা সুচিহ্নিত করেছেন। ভালোবাসায় নারীর আত্মত্যাগ, আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা সত্যিই বিস্ময়কর। এপ্রসঙ্গে নারীর যথার্থ মূল্যায়ন উঠে এসেছে ইন্দিরার স্বামী মহিমের মন্তব্যে—

"এই একটি জায়গায় পুরুষ স্ত্রীলোককে কিছুতেই বুঝতে পারে না। মনে হয় এইখানে এসে একটুক্ষণের জন্য তাদের জীবন পরস্পরকে ছুঁয়ে আবার যেন আলাদা হ'য়ে গেছে। কি ক'রে যে মেয়েরা অযোগ্যের পায়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত নিজেকে লুটিয়ে দেয়, কেমন ক'রে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত বিধবা তার অনাদৃত জীবন, যৌবন একটি মাত্র বিগ্রহের চরণে নিঃশেষ ক'রে নিবেদন করে— সে কথার আমি কী জানি যে, এর উত্তর খুঁজে পাব। সেই যে একটা কথা আছে— নারী-চরিত্র স্বয়ং বিধাতারও অজ্ঞাত, বোধ করি সেই কথাটাই ঠিক।"[২৩]

নারীপ্রগতি ও নারীস্বাধীনতার ধ্বজাধারী সুপ্রভা বিয়ের আগে দেখেশুনে আলাপ-পরিচয় করে বিয়ে করে সুবিমলকে। সুবিমল ব্যারিস্টার আর সুপ্রভা নারীসমিতির বিশিষ্ট সদস্য। তাদের বিয়ের এক বছরও পূর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে দু'জনের মনোমালিন্য নানাপ্রসঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও সুবিমল সুপ্রভার সান্নিধ্যলাভে ভীষণভাবে আগ্রহী। কিন্তু সুবিমলের রোম্যান্টিক মন বিশেষ আমল পায় না সুপ্রভার তথাকথিত শিক্ষিত মার্জিত রুচিবোধের কাছে। স্বাধীনচেতা সুপ্রভার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রাচীরে বাধা পেয়ে সুবিমলের প্রেমের আবেদন বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। সুবিমলের বিশ্বাস, "সমস্ত উদ্ধত ব্যক্তিত্বকে একটি নম্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে নত করেই তবে লোকে প্রেমের রাজ্যে ঢুকতে পায়। ও বস্তুকে অহমিকায় পর্ব্বত প্রমাণ করে আজও ভালবাসার মধ্যে কেউ সুখ বা সামঞ্জস্য আনতে পারে নি।"[২৪] কিন্তু কোনো মূল্যেই সুপ্রভা নিজ ব্যক্তিত্ব, অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে আপস করতে রাজি নয়। তার দ্বিধাহীন স্পষ্ট বক্তব্য—

"মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আছে। কোন ভালোবাসার মোহেই একে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। সুখের চেয়ে আমার স্বাধীনতা ঢের বেশি বড়।"[২৫]
"তাই এক বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়েও 'তাহাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান রচিয়া জাগিয়া রহিল সুপ্রভা দেবীর সুতীক্ষ্ণ এবং দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব'[২৬]*।*

সুপ্রভার এই ধরনের বিশ্বাস ও বক্তব্য আমাদের ভাবতে বাধ্য করে— সত্যিই কি ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের মধ্যে এতটাই বিরোধ? বা, আদৌ কি এদের বিরোধিতার আসনে বসানো যায়? ভালোবাসা মানুষের মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর মানুষের সমস্ত গুণাগুণ ও তার বহিঃপ্রকাশেই প্রকটিত হয় ব্যক্তিত্ব। ভালোবেসেও স্বাধিকার, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা যায়। প্রয়োজন ব্যক্তিত্বের সঠিক ভারসাম্য, যা এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে। তাই বলতেই হয়, বিশেষ ভ্রান্তিবশত সুপ্রভা দাম্পত্যপ্রেমের মাঝে নিজ ব্যক্তিত্বকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করায়। 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে লেখিকা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষিত নারীর চিন্তাচেতনার এই ভ্রান্তির প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, তৎকালীন সমাজে বাঙালি পরিবারে কন্যাসন্তান কতটা অবহেলিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। তাদের আবির্ভাবের জন্য অভিযুক্ত হতে হতো তাদের গর্ভধারিণীকে। সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন ঘটলেও তা প্রয়োজন হয়ে ওঠেনি। বিয়েই ছিল নারীজীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেখানে শিক্ষাদীক্ষা বা গুণ নয়, নারীর রূপ-রঙই বিবেচ্য। শ্বশুরবাড়িতে তারা পদার্পণ করে আচার-সংস্কারের বেড়ি পরে। উপযুক্ত সম্মান বা মর্যাদা কোনোটাই তারা পায় না। সমাজ তাদের ঊনমানব হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। একতরফা আপস করে তারা শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলে। নিজেদের জন্মস্থানটিকে ভুলে নতুন পরিবারটিকে আপন করে নেয় মুহূর্তের মধ্যে। তা অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায় তাদের সত্তার সঙ্গে। সেই সঙ্গে সংসারের প্রতি নারীর অন্তরের টান, সংসার পরিচালনার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা-বিচক্ষণতারও পরিচয় মেলে। আবার শিক্ষিতা নারীর মনোভঙ্গির ভ্রান্তিকেও লেখিকা তুলে ধরেছেন এক নির্মোহ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। অর্থাৎ সেকালের সমাজ-পরিবারে নারীর অবস্থান-যন্ত্রণা-

পেষণ, নারীর ব্যক্তিত্ব-বিচক্ষণতা-মন-চেতনা-সত্তা-ভ্রান্তির এক সামগ্রিক চিত্র আশালতা সিংহের গল্পে আমরা খুঁজে পাই।

তথ্যসূত্র:

১। সিংহ, আশালতা, 'নারীর মূল্য', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ২৬২।

২। সিংহ, আশালতা, 'নারীর মূল্য', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ২৬৩।

৩। সিংহ, আশালতা, 'নারীর মূল্য', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ২৬৫।

৪। সিংহ, আশালতা, 'কালো মেয়ে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩২২।

৫। সিংহ, আশালতা, 'ছ'বছর পরে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২৫।

৬। সিংহ, আশালতা, 'ছ'বছর পরে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২৯।

৭। সিংহ, আশালতা, 'ছ'বছর পরে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২৩।

৮। সিংহ, আশালতা, 'ছ'বছর পরে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২৭।

৯। সিংহ, আশালতা, 'ছ'বছর পরে', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২৬।

১০। সিংহ, আশালতা, 'যাত্রা', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৬৪।

১১। সিংহ, আশালতা, 'যাত্রা', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৬৫।

১২। সিংহ, আশালতা, 'মেয়েমানুষ', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৩৪।

১৩। সিংহ, আশালতা, 'রান্নাঘর', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৪৬।

১৪। সিংহ, আশালতা, 'রান্নাঘর', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৪৭।

১৫। সিংহ, আশালতা, 'অতিথি', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ২৫৬।

১৬। সিংহ, আশালতা, 'অতিথি', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ২৫৯।

১৭। সিংহ, আশালতা, 'বড়বৌ', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪১২।

১৮। সিংহ, আশালতা, 'বড়বৌ', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪১১।

১৯। সিংহ, আশালতা, 'মোটর কেনা', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৪৯।

২০। সিংহ, আশালতা, 'মোটর কেনা', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৫৩।

২১। সিংহ, আশালতা, 'নারী-চরিত্র', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪১৩।

২২। সিংহ, আশালতা, 'নারী-চরিত্র', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪১৯।

২৩। সিংহ, আশালতা, 'নারী-চরিত্র', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪২০।

২৪। সিংহ, আশালতা, 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪৭২।

২৫। সিংহ, আশালতা, 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪৭৩।

২৬। সিংহ, আশালতা, 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৪৭৪।